দৈনিক মাধুকর

বিশ্ব পানি দিবস

'Glacier Preservation'/ 'হিমবাহ সংরক্ষণ'

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ২২ মার্চ ২০২৫ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

সুপেয় পানি পেতে রক্ষা করতে হবে হিমবাহ

বিশ্ব পানি দিবস আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয়। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেরিওতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের এজেন্ডা ২১- এ দিবসটি পালনের প্রস্তাব করা হয়। একই বছরের ২২ ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তা গৃহীত হয়। জাতিসংঘ গৃহীত রেজুলেশন ও ঘোষণা অনুসারে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি বছর পানি দিবস পালিত হয়ে আসছে।

প্রাণিকুলের অস্তিত্বের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে জানানো এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুপ্রাণিত করাই পানি দিবস পালনের উদ্দেশ্য। এছাড়া মিঠা পানির গুরুত্বের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা এবং মিঠা পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার পক্ষে মত প্রকাশ ও এডভোকেসি করা।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Glacier Preservation' বাংলায় 'হিমবাহ সংরক্ষণ'। হিমবাহ, পাহাড়ে জমে থাকা পানি এবং তুষার গলা পানি প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষকে পানীয়, কৃষি এবং শক্তি উৎপাদনে সরাসরি ভূমিকা রাখে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্যের মূল বার্তা হলো জলচক্রে হিমবাহ এবং পানি প্রবাহের অনিশ্চয়তার সাথে খাপ খাইয়ে জীবন ও জলচক্র টিকিয়ে রাখার স্থানীয় কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো।

পানি প্রাপ্তি একটি মানবাধিকার। তা সত্ত্বেও ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানীয়জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থায় পানীয়জল পরিষেবা বঞ্চিত মানুষের জীবন এবং বৃহত্তর সমাজের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। যদিও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলো বাস্তবায়ন ঠিক এখনও নাজুক।

নিরাপদ পানির ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ। বিশেষতঃ শুষ্ক মৌসুম ছাড়া সারা বছরই পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায়; তবে বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা 'পানি মানুষের মৌলিক অধিকার' রক্ষায় কাজ করছি। এসকেএস ফাউন্ডেশন পানি সরবরাহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজ করছে। বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলে পানি সংকট মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় পানির উৎস সংরক্ষণ এবং খরা-সহনশীল কৃষির প্রসারে কাজ করছে এসকেএস ফাউন্ডেশন। এছাড়া, দুর্গম চর ও বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসকেএস বিভিন্ন ধরনের লাগসই প্রযুক্তির প্রসার ঘটাচ্ছে। FANSA- Bangladesh এর সচিবালয় সংস্থা হিসাবে পল্লী অঞ্চলের পাশাপাশি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার পানি ও স্যানিটেশন পরিস্থিতির উন্নয়নে এ্যাডভোকেসি পরিচালনা করছে এসকেএস ফাউন্ডেশন।

অন্যান্য বছরের মত এবারও বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা আয়োজনে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের পানি ও স্যানিটেশন সেবা দেয়ার সাথে সাথে বন্যপ্রবণ চরাঞ্চলের মানুষের জীবন ও জানমাল রক্ষায় কাজ করছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পানি অধিকার সচেতনতায় এসকেএস ফাউন্ডেশনও আজ পালন করছে নানা কর্মসূচি। পানি অধিকার রক্ষায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

নদী রক্ষা: বাংলাদেশের জীবনীশক্তি

এ, কে, এম, আব্দুল মতিন

সাধারণত বিশ্বব্যাপি উদযাপিত দিবসগুলির প্রতিপাদ্য হয় সারা বিশ্বের জন্য একই। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব পানি দিবস ২০২৫-এর প্রতিপাদ্য আলাদা। কেন? বিশ্বব্যাপি পানি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপর আলোকপাত করার জন্য প্রতি বছর একটি অনন্য প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন দৃশ্যমান। হিমবাহ আগের চেয়ে দ্রুত গলে যাচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। হিমবাহের এই দ্রুত গলন থামানো না গেলে ভূখন্ডের বড় একটি অংশ অদূর ভবিষ্যতে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞগণ। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের মতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য সূচক বিবেচনায় ঢাকাসহ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ছয়টি শহর সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে, এমন ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। আর তাইতো বিশ্ব পানি দিবসে আন্তর্জাতিকভাবে ২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য হলো 'হিমবাহ সংরক্ষণ'। কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে 'হিমবাহ সংরক্ষণ' এর গুরুত্ব সেভাবে অনুধাবন করবে না। আর তাইতো 'হিমবাহ সংরক্ষণ' এর সঙ্গে সম্পর্কিত জনগনের সহজ বোধগম্য এবং প্রাণের আকুতির সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য প্রতিপাদ্য ঠিক করেছেন "নদী রক্ষা: বাংলাদেশের জীবনীশক্তি" এর প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর গবেষণা মতে বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা ৪০৫টি। তবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের নদ-নদী: সংজ্ঞা ও সংখ্যা" শীর্ষক গ্রন্থের তথ্যমতে শাখা-প্রশাখাসহ প্রায় ১,০০৮টি নদ-নদী যা প্রায় মোট ২২,১৫৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সৌভাগ্যবান বাংলাদেশে এই সমস্ত নদ-নদী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মিঠা পানি। আর হয়তোবা তাই আমাদের ভূগর্ভস্থ পানিও মিঠা পানির আধার। তার মানে হচ্ছে আমাদের দেশ মিঠা পানির দেশ। আর বিশ্ব পানি দিবস মিঠা পানির টেকসই ব্যবস্থাপনার পক্ষে সচেতনতার আহবান জানায়। তাহলে ব্যত্যয়টা কোথায়?

ভাটির দেশ বাংলাদেশ। প্রবাহমান জলরাশি নদীপথে প্রবাহিত হয়ে এ দেশের পাদদেশে মিলিত হচ্ছে সাগরে। উজানের দেশ থেকে সেই নদীপথে বয়ে আসছে বিপুল পরিমান পলি। কমে যাচ্ছে নদীগুলোর নাব্যতা, হারাচ্ছে পর্যাপ্ত বা প্রয়োজনীয় পানি ধারণ ক্ষমতা। বর্ষায় নদীর কূল ছাপিয়ে দেশব্যাপি হচ্ছে অপ্রত্যাশিত বন্যা, গ্রীষ্মে নদীগুলো হচ্ছে পানিশূন্য। আর নদীগুলোতে উজানের পানির প্রবাহের কারণে চাপ না থাকায় এবং হিমবাহের দ্রুত গলনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে নদীগুলিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ঢুকে যাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বাড়ছে। মিঠা পানি পেতে বসাতে হচ্ছে গভীর নলকূপ। অনেকক্ষেত্রে গভীর নলকূপেও কাজ হচ্ছে না। পানযোগ্য পানির জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের পানির উপর অথবা বৃষ্টির পানির উপর। ভূপৃষ্ঠের পানিকে নিরাপদ পানযোগ্য পানিতে পরিণত করতে খরচ বাড়ছে, বসাতে হচ্ছে রিভার্স অসমোসিস, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ইত্যাদি। বাড়ছে বিভিন্ন প্রকৃয়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ। পাশাপাশি খরচ বাড়ছে পানযোগ্য পানির পিছনে।

বর্ষায় বন্যা হবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বন্যা কেন? বাংলাদেশের উজানে নেপালে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা। হিমালয়ে রয়েছে অনেক হিমবাহ। আবার সেখানে উত্তর-পূর্ব নেপালে রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ খুম্বু হিমবাহ। এভারেস্টে নেপালের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত সাউথ কোল হিমবাহ নামে বিশ্বের আরেক বৃহৎ হিমবাহ। নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত সাময়িকী ক্লাইমেট অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক সায়েন্স প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের দুই হাজার বছরের পুরানো এই হিমবাহ মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বছরে প্রায় ২ মিটার উচ্চতায় গলে যাচ্ছে। হিমবাহ যতটা সময় নিয়ে তৈরি হয়, তার চেয়ে ৮০ গুণ দ্রুততার সঙ্গে এটি গলছে। দি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন ডেভেলপমেন্ট (আইসিআইএমওডি) তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগ থেকেই এভারেস্টের বরফ আশঙ্কাজনক হারে গলছে; যা চলতি শতকের মাঝামাঝিতে পুরোপুরি গলে যেতে পারে। এ আশঙ্কা হিমালয়কে ঘিরে থাকা এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্ক বাড়িয়েছে। হিমবাহ ধসে পড়লে এশিয়ার শত কোটির বেশি মানুষের সুপেয় পানি, খাবার ও জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। কারণ, হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীর ওপর তাদের জীবন নির্ভরশীল, এবং বাংলাদেশের মানুষ সেই অঞ্চলের অধিবাসি। আর তাই শুধু স্বাভাবিক নয়, অপ্রত্যাশিত বন্যাও আমাদের নিত্যসঙ্গী হতে চলেছে। বন্যার দুর্ভোগ আমাদের চেয়ে বেশি কেউ জানেনা। কিন্তু আমরা পড়ছি উভয় সংকটে। হিমালয়ের হিমবাহ এর গলিত পানি বাংলাদেশের নদীর কূল ছাপিয়ে মিলিত হচ্ছে সাগরে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মিলিমিটার হারে বাড়ছে। এতে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বাড়ছে, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস এবং জীববৈচিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যতবাণী অনুসারে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২৮ থেকে ৯৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) এর হিসাব অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩২ সেন্টিমিটার বাড়তে পারে, ফলে বাংলাদেশের কমপক্ষে ১০% এলাকা সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ওয়াটারএইড বাংলাদেশের তথ্য মতে, বাংলাদেশের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের সুযোগ নেই, পানির দূষণ একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয় যা ৮৬% দরিদ্র পরিবারে ই. কোলাই দূষণ দেখা দিয়েছে। হিমবাহ জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ- তাদের গলিত পানি পানযোগ্য পানি, কৃষি, শিল্প, পরিষ্কার, শক্তি উৎপাদন এবং সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু তা হতে হবে পরিমিতভাবে এবং হিমবাহ সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, মিঠা পানির প্রয়োজনীয়তা এবং উপরের আলোচনা বিবেচনায় বাংলাদেশের নদীগুলোতে প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। আর তাইতো ২০২৫ সালের বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য 'হিমবাহ সংরক্ষণ' এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিশ্ব পানি দিবসে বাংলাদেশের প্রতিপাদ্য "নদী রক্ষা: বাংলাদেশের জীবনীশক্তি"। গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি: তারিখের সভায় বিশ্ব পানি দিবস-কে "ঘ" শ্রেণি থেকে "ক/খ শ্রেণিতে উন্নীতকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অতএব, বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন করার মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করে নিরাপদ পানির প্রবেশগম্যতার গুরুত্ব বুঝাতে হবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.১ যা '২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ'অর্জনকে তরান্বিত করতে বাংলাদেশ তথা বিশ্বকে সহায়তা করতে হবে।

নিরাপদ পানি ও মানবাধিকার

ড. অনামিকা সাহা

পানির অপর নাম জীবন। পানির অভাব যেমন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে ঠিক তেমনি অনিরাপদ পানিও জীবন ধ্বংসের কারণ হতে পারে। বিশুদ্ধ পানি সব ধরনের মানবাধিকারের ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত। মানুষের জন্য বিশুদ্ধ উন্নত উৎসের পানি সরবরাহ এখনো সীমিত পর্যায়েই রয়েছে। মলের জীবাণু রয়েছে, এমন উৎসের পানি পান করছে এদেশের ৪১% এর বেশি মানুষ। শহরাঞ্চলের খাবার পানির এক-তৃতীয়াংশেই উচ্চমাত্রার ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া বিদ্যমান, যা ডায়রিয়ার প্রধান একটি কারণ। পানি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি শুধু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান নয়, বরং পরিবেশ, অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দিনদিন নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা কমছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানির অভাবে ভুগছে এবং এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ নিরাপদ পানি সংকটের মুখোমুখি। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। নিরাপদ পানি প্রাপ্যতা বিশ্বজুড়ে একটি বড় সংকটে পরিণত হতে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ নিরাপদ পানীয় জল এবং স্যানিটেশনকে মানবাধিকার হিসেবে বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেছে বেশ কয়েকবার। দেশটি ২৮ জুলাই ২০১০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন ৬৪/২৯২ (পানি এবং স্যানিটেশনের মানবাধিকার) "জীবন এবং সকল মানবাধিকারের পূর্ণ উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় মানবাধিকার হিসেবে নিরাপদ এবং পরিষ্কার পানীয় জল ও স্যানিটেশনকে স্বীকৃতি দেয়" (ইউএন, ২০১০)। একইসাথে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিটি অধিকারের ৪টি মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে বিশেষ কোন বৈষম্য ছাড়াই এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি দেশ কিভাবে সর্বজনীন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের সুবিধা দিতে পারে এ ব্যাপারে একটি দিক নির্দেশনামূলক ধারণা দেয়। জাতিসংঘের পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার বিষয়ক বিশেষ বার্তাবাহক প্রাপ্যতা, প্রবেশগম্যতা, সামর্থকতা ও গুণগত মান অধিকারের এই চারটি স্তম্ভ নিশ্চিত হলে পানি ও স্যানিটেশনের মানবাধিকার নিশ্চিত হবে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে উল্লেখ করেন। তবে এই চার স্তম্ভ পানির ক্ষেত্রেই হোক, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক- একই। অধিকারের এই চার স্তম্ভ মাথাপিছু মাসিক আয়-ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়ের সাথে জড়িত। এই ভোগ-ব্যয়ের মধ্যে যদি মাথাপিছু পানি স্যানিটেশনের ভোগ-ব্যয় পর্যাপ্ত না হয় তাহলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব না। সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রাপ্তি সকলের অধিকার হলেও বিষয়টি সহজবোধ্য করে সকলের কাছে এখনও না পৌছানোর কারণে এই বিষয়ে জনগণের আস্থা অর্জনে সময় লাগছে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এই অধিকারকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পানি আইন প্রণীত হয়েছে যা পানীয়, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির জন্য পানি "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার অধিকার" হিসেবে ঘোষণা করেছে (জিওবি, ২০১৩)। মানব মর্যাদা রক্ষায় নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তি একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এসডিজি, যা "গ্লোবাল গোলস" নামেও পরিচিত, এমডিজি এর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত। ১৭টি লক্ষ্যের এসডিজি দারিদ্র্য দূর করা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করা এবং সবার জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার একটি নতুন এজেন্ডা উপস্থাপন করে। এসডিজি এর মধ্যে একটি লক্ষ্য সরাসরি নিরাপদ পানির সাথে সম্পর্কিত, লক্ষ্য ৬ (পরিষ্কার পানি এবং স্যানিটেশন), যা মূলত "২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পানীয় জলের সার্বজনীন এবং ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার অর্জন"এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

এখনই বিশুদ্ধ পানির ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হতে হবে সরকারকে। এজন্য বিশুদ্ধ পানির উৎসস্থল নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় রক্ষায় কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। বেশি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি বাড়িতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহৃত পানি পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শিল্পকারখানার বর্জ্য, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং আবর্জনা প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনার বর্জ্য নদী বা জলাশয়ে ফেলা বন্ধ করতে হবে। শিল্পকারখানায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) বাধ্যতামূলক করতে হবে। পানি ব্যবহারে সংযমী হতে জনসাধারণকে উৎসাহী করতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করা এবং ভূপৃষ্ঠের পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনী পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করতে হবে। পুকুর, দিঘি, খাল-বিল-নদীসহ যে কোনো জলাশয় ভরাট বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা সত্তর দশক থেকেই উন্নয়ন ধারায় ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল। সুপেয় বা নিরাপদ পানি প্রাপ্যতা এখনও দেশের কোথাও কোথাও মরীচিকা। এই জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পানি ও স্যানিটেশনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তা না হলে জাতিসংঘের ঘোষণা এবং পরবর্তীতে মানবাধিকার আইনের স্বীকৃতি কাগজেই থেকে যাবে। সর্বজনীন পানি ও স্যানিটেশন সেবার মূল ধারণা হচ্ছে, পানি ও স্যানিটেশন সেবা বঞ্চিতদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সকলকে সেবার আওতায় আনা।

উপাধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ।

হিমবাহ ও আমাদের অস্তিত্ব

সাহা দীপক কুমার

জলবায়ু ব্যবস্থায় হিমবাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তাদের গলে যাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০২৫ সালকে, জাতিসংঘ "আন্তর্জাতিক হিমবাহ সংরক্ষণ বছর" হিসেবে ঘোষণা করে, এবং ২১শে মার্চকে "বিশ্ব হিমবাহ দিবস" হিসেবে ঘোষণা করে। সাথে সাথে ২০২৫ সালের বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'হিমবাহ সংরক্ষণ', জীবন ও জলচক্র টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে হিমবাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এ বছর **'Glacier Preservation'** বিষয়টিকে বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের এই আন্তর্জাতিক বর্ষ এবং বিশ্ব দিবসের লক্ষ্য হলো জলবায়ু ব্যবস্থা এবং জলচক্রে হিমবাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বিশ্বে হিমবাহ, পাহাড়ে জমে থাকা পানি এবং তুষার গলা পানি প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষকে পানীয়, কৃষি এবং শক্তি উৎপাদনে সরাসরি ভূমিকা রাখে। হিমবাহ কেবল একটি বরফের নদী নয়, সে যেমন ভূমিরূপের পরিবর্তন করে, তেমনই জলবায়ুর পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া হিমবাহ হল সুপেয় জলের জমাটবদ্ধ রূপ। পৃথিবীর মোট জলের (১) ৯৭.২ শতাংশ লবণাক্ত সমুদ্রজল। যা পানের অযোগ্য। (২) বাকি ২.৮% পানযোগ্য। এই জলের মাত্র ০.০০০১ ভাগ নদনদীতে, ০.৯৯৯৯ ভাগ ভৌমজল হিসেবে এবং বাকি ২.১৫% হিমবাহের মধ্যে বরফ হিসেবে জমে রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, পৃথিবীতে যত পানীয় জলের সঞ্চয় রয়েছে তার ৭৭%ই হিমবাহ হিসেবে জমাট বেঁধে রয়েছে। আর এই বরফের ৯০% রয়েছে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু প্রভৃতি সব গুরুত্বপূর্ণ নদীই হিমবাহ থেকেই সৃষ্ট। সুতরাং পানীয় জলের সংরক্ষণ করতে হলে অবশ্যই হিমবাহ সংরক্ষণে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্রায়োস্ফিয়ার ইনিশিয়েটিভের তথ্য অনুযায়ী, হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহ বৈশ্বিক গড় উষ্ণায়নের তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে গলছে। বিশ্বজুড়ে দুই লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশি হিমবাহ রয়েছে, যা প্রায় ৭ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই হিমবাহগুলোতে বিশ্বের মোট মিঠা পানির প্রায় ৭০% জমা রয়েছে। বিশ্ব গেশিয়ার মনিটরিং সার্ভিস (**WGMS- world glacier monitoring service**) প্রায় দুই লাখ ১০ হাজার হিমবাহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। তাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বিশ্বের প্রায় সব হিমবাহ অঞ্চলই সঙ্কুচিত হচ্ছে। ১৯৭৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে হিমবাহের ভর হ্রাসের হার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহ গলার বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ২০৩০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হিমবাহ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন। পশ্চিম কানাডার পেটো হিমবাহ এবং নেপালের লাংটাং ভ্যালির ইয়ালা হিমবাহ দ্রুত বিলুপ্তির পথে। তারমধ্যে নেপালের লাংটাং ভ্যালির ইয়ালা হিমবাহও বিলুপ্তির পথে। ২০১১ সালে এর উচ্চতা ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,১৭০ ৫,৭৫০ মিটারের মধ্যে, যা এখন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এর সঙ্গে আঁমাদের নদীপ্রবাহের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

ইউনেস্কোর নতুন একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, কার্বন নির্গমনের ফলে পৃথিবী উষ্ণ হওয়ার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে আইকনিক হিমবাহগুলোর মধ্যে কয়েকটি ২০৫০ সালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইউনেস্কো ৫০টি হেরিটেজ সাইটে পৃথিবীর প্রায় ১৮,৬০০ হিমবাহ পর্যবেক্ষণ করে ১০% চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ (মাউন্ট এভারেস্টের পাশে), দীর্ঘতম (আলাস্কায়) এবং আফ্রিকার অবশিষ্ট হিমবাহ রয়েছে। ইউনেস্কো বলছে, প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি না হয়, তবে হেরিটেজ সাইটের অবশিস্ট এক-তৃতীয়াংশ হিমবাহকে এখনো বাঁচানো সম্ভব।

বাংলাদেশে সুউচ্চ পর্বতমালা নেই। তার ওপর আমাদের দেশ মেরু অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। এ দুটি কারণে আমাদের দেশের মানুষের কাছে হিমবাহ কেবল কৌতূহলেই সীমাবদ্ধ। বরফের প্রকাণ্ড জমাট প্রাকৃতিক কাঠামোকে অচেনা ও অনেকটা অপার্থিব বলে মনে করাই অমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ অচেনা প্রকৃতির সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হওয়া আমাদের কাছে স্বপ্নের মত। এ অপরিচিত অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ জমাট হিমবাহ থেকেই নদীর জন্ম, আমাদের সুপেয় পানির উৎস। হিমবাহগুলো রক্ষা পেলেই টিকে থাকবে আমাদের অস্তিত্ব।। **সূত্র: জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, IPCC ও পত্রিকা।**

মিতব্যয়ী হতে হবে পানি ব্যবহারে, এখনই

বাহারাম খান

পানির অপরিহার্যতা এবং এর বহুমাত্রিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের বিস্তৃত ধারণা না থাকলে আমরা এ সংকটপূর্ণ মহামূল্যবান সম্পদটি বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য রক্ষা করতে পারবোনা।

আমরা জানি এ পৃথিবীর ভূ-উপরিস্থলের দুই তৃতীয়াংশ পানি আর এক তৃতীয়াংশ স্থল রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এতো ব্যাপক পানির সংস্থান থাকলেও মানুষের ব্যবহার্য ও পান করার পানির পরিমান খুবই কম। পৃথিবীতে যত পানি রয়েছে তার মধ্যে ৯৭% লবণ পানি আর মাত্র ৩% মিঠা পানি। আবার এ ৩% মিঠা পানির ৬৮.৭% বরফ, বরফের শীট ও হিমবাহ যা কোনভাবেই মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়, ৩০.১% ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং মাত্র ০.৩% ভূ-উপরিস্থ মিঠা পানি। আবার এ ০.৩% এর ৮৭% রয়েছে বিভিন্ন হ্রদে যার মধ্যে শুধু বৈকাল হ্রদেই রয়েছে পৃথিবীর অর্ধেক মিঠা পানি, ১১% রয়েছে বিভিন্ন জলাভূমিতে এবং মাত্র ২% রয়েছে খালে বিলে যা বিশ্ববাসী মানুষের ব্যবহারের জন্য। এ পরিসংখ্যান থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি আমারা না বুঝে অকারণে যে পানি অপচয় করে যাচ্ছি তা কতোখানি মূল্যবান। কত নগন্যই না রয়েছে মানুষের ব্যবহারযোগ্য ও পান করার পানি। প্রকৃতি আমাদের যতটুকু পানি দিয়েছে ব্যবহারের জন্য সে পানিটুকুই বর্তমান বিশ্বের ৭.৮ বিলিয়ন মানুষসহ প্রাণিজগৎ এবং প্রায় ৯০% উদ্ভিদজগৎ ব্যবহার করছি। পান করছি, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করছি, কৃষি, শিল্প, উৎপাদন সকল কাজে ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবন চালনা করছি। একবারও কী ভেবে দেখেছি যে এটুকু পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের জীবন জীবিকা কোথায় কিভাবে পরিচালিত হবে। কিন্তু একথা তো সত্য যে, মিঠা পানির একটা নির্দিষ্ট মজুদ রয়েছে তা কোন না কোন সময় নিঃশেষ হয়ে আসবেই। অথচ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নির্বোধের মত এ পানিকে দূষিত করছি, বিষাক্ত করছি, পানের অযোগ্য করে তুলছি, ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলছি। পানির অপচয় রোধ করে, পানি দূষিত ও বিষাক্ততা রোধ করে এটুকু পানিতে বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষের নিরাপদ প্রাপ্তি বা প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং এটা মানবাধিকারও।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-৬) এর লক্ষ্য হলো- সকলের জন্য নিরাপদ পানি এবং পয়ঃ নিষ্কাশন নিশ্চিত করা। পানির অপরিহার্যতা এবং এর বহুমাত্রিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের অধিক ধারণা না থাকলে আমরা এ সংকটপূর্ণ মহামূল্যমান সম্পদটি বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য রক্ষা করতে পারবো না।

আমদের দেশের কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে পানির অধিক প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা দেখে আমরা এর সংকটের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছি না। অথচ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে পানির যে তীব্র সংকট তা সে সকল জেলার অধিবাসীরা অনুধাবন করতে পারছে। সেখানে পানির স্তর এতো নীচে নেমে গেছে যে, কৃষিকাজ তো দুরের কথা পারিবারিক স্বাভাবিক প্রয়োজনেও পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যেখানে (গাইবান্ধা, রংপুর) মাটির ৩০-৪০ ফুট নীচে সহজেই পানি পাই, সেখানে রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জসহ বরেন্দ্র এলাকায় ৩০০-৪০০ ফুট মাটির নীচেও পানির সন্ধান পাওয়া কস্টকর। খরা মৌসুমে পানির প্রকটতা আরো ব্যাপক। আমরা যারা অবহেলায় মূল্যবান এ প্রাকৃতিক সম্পদটি হেলাফেলায় অপচয় করছি, তারা হয়তো জানি না, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক এর তথ্য মতে বিশ্বে প্রায় ৭৭ কোটিরও বেশি মানুষ তাদের বাড়ির আশেপাশে নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রতিবছর অনিরাপদ পানি ও দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য প্রায় ১০ লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ এর ২০২৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ২.২ বিলিয়ন মানুষ এখনও পানীয় পানি ছাড়াই বসবাস করে; যার মধ্যে ১১৫ মিলিয়ন মানুষ ভূপৃষ্ঠের জীবানুযুক্ত পানি পান করে।

-আইপিসিসি এর ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বছরের অন্তত কিছু অংশে তীব্র পানি সংকটে পতিত হয়।

-বিশ্ব ব্যাংক এর ২০২২ সালের রিপোর্টে পানি সম্পর্কিত বিপর্যয়গুলি বিগত ৫০ বছরের দুর্যোগের তালিকায় প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত মৃত্যুর ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী।

-সমষ্টিগতভাবে সারা বিশ্বে নারী এবং কিশোরী মেয়েদের প্রতিদিন ২০০ মিলিয়ন ঘন্টা পানির জন্য হাটতে হয়।

-প্রতিবছর বৈশ্বিক কারণে পানি সংকটে ৪৪৩ মিলিয়ন স্কুল মিস হয়।

-পানি সংক্রান্ত অসুস্থতার কারণে প্রতি বছর ৮২৯০০০ মানুষ মারা যায়।

-উন্নয়নশীল বিশ্বের হাসপাতালগুলোতে ৫০% বেড পানি সংক্রান্ত রোগীর দ্বারা ভরা থাকে।

-বিশ্বের ৩.৬ বিলিয়ন মানুষের পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

বর্তমানে আমাদের দেশে বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের দক্ষিনাঞ্চল, পাহাড়ি এলাকায় রয়েছে তীব্র পানির সংকট। যার প্রভাব পড়ছে মানব স্বাস্থ্য ছাড়াও কৃষিতে। পানি বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের মতে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ হ্রাস পাবে আশংকাজনক হারে। যার ফলে আরো তীব্র হবে পানির সংকট। পানির এ সংকটময় প্রভাব পড়বে কৃষিতে, সেচের পানি কমে যাবে। খাদ্য শষ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। মৌসুমি বৃষ্টিপাত আরো কমে যাবে, যার ফলে পানির স্তর আরো নীচে নেমে যাবে।

পরিবর্তীত এ পরিস্থিতিতে পানির অপব্যবহার, অপচয় রোধ করা এখন সময়ের দাবি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য, আগামী প্রজন্মকে একটি সবুজ প্রকৃতি হস্তান্তর করার জন্য পানি ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। জলাভূমি রক্ষা, খাল বিল নদী নালার পানি দুষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পানি রক্ষা করার কোন বিকল্প নাই।

পানি যে একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এটির নিঃশেষ আছে, ব্যবহারে সাবধান বা মিতব্যয়ী না হলে এক সময় তা ফুরিয়ে যাবে এমন ধারণা হয়তো জেনেও জানি না বা বিশ্বাস করি না। আমাদের দেশের কৃষকেরা কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অতি মাত্রায় পানি ব্যবহার করে। তাদের ধারণা কৃষি জমিতে বা ফসলে যত বেশি সেচ দেয়া যায় ফসল ততো বেশি পাওয়া যায়। এরকম একটি ভূল ধারণা থেকে তারা তাদের প্রতিটি কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পানি ব্যবহার করছে এবং মজুদকৃত পানির অপচয় করছে। সরকারের কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ি দেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৮.২৯ লাখ হেক্টর এর মধ্যে ৭৮.৭৮ হাজার হেক্টর জমিতেই সেচ দিতে হয়। ২০১৫-'১৬ সালের কৃষি বিভাগের গবেষনায় দেখা গেছে এক কেজি ধান উৎপাদনে পানি লেগেছে ৬৬১ লিটার, আর ২০১৬-'১৭ সালে লেগেছে ৫৮৪ লিটার। অথচ আমাদের দেশের কৃষকেরা এক কেজি বোরোধান উৎপাদনে পানি ব্যবহার করছে ২৫০০-৩০০০ লিটার। এই যে অতিরিক্ত পানির অপচয় যা পানি সংকটের বৈশ্বিক প্রভাব নিঃসন্দেহে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন কৃষকদের পানি ব্যবহারে অধিক সচেতন করা। মূল্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ পানি, যেকোন মূল্যে সংরক্ষণ, রক্ষা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত করতে হবে। পানির অপচয় রোধের শিক্ষা পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানির অপচয় রোধ কল্পে শিক্ষা প্রদান শুরু করতে হবে এবং পাঠ্য পুস্তকে এ বিষয়ে অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হলে শিশুরা পাঠের মাধ্যমে পানির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে। দেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা ও অপচয় রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করলে মানুষ আরো সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবে। পানি প্রতিটি প্রাণির বেচেঁ থাকার প্রধান অনুসঙ্গ। পরিবেশ, প্রতিবেশ, কৃষি- সকল কিছুই আবর্তিত পানি দিয়ে, পানিকে ঘিরে। লক্ষ-কোটি প্রাণির জীবন-মরণ নির্ভর করে পানির উপর। অথচ এই পানি আমরা না বুঝে, অজান্তেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রতিদিন নষ্ট করছি। হারিয়ে যাচ্ছে. প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে আমাদের সকলের জীবন রক্ষাকারী অমূল্য সম্পদ পানি। যা আমাদের ভবিষ্যত জীবনের জন্য হুমকি। আর তাই পানির আধার পরিপূর্ণ রাখা, অপচয় রোধ করা, ভবিষ্যতের পানি সংকট মোকাবিলায় ব্যক্তিগত সচেনতার কোন বিকল্প নেই।

খুবই সহজ একটা হিসাব যদি আমারা দেখি, বাংলাদেশে ১৮ কোটি মানুষ। যদি প্রতিদিন প্রতিটি মানুষ এক গ্লাস পানি (২৫০ মিঃলিঃ) অপচয় না করি তাহলে প্রতিদিন ৪.৫ কোটি লিটার পানি আগামীকালের জন্য রক্ষা করা সম্ভব।

সম্পাদক: কে এম রেজাউল হক, প্রকাশক: রাসেল আহম্মেদ লিটন কর্তৃক এসকেএস প্রিন্টার্স, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত ও সাবেক বিজেএমসি ভবন, শনিমন্দির রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত।
সার্কুলেশন: ০১৭০১৭৬৪৮৩০, e-mail: dailymadhukar@gmail.com